মহীতোষ বিশ্বাস

রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সংকলন ও সম্পাদনা

অভিষেক বিশ্বাস ঋত্বিকা বিশ্বাস

পুনশ্চ

সূচিপত্র

মহীতোষ বিশ্বাস :
জল মাটি ও মেহনতি মানুষের কথাকার / রামকুমার মুখোপাধ্যায় ০৯

মাটি এক মায়া জানে ১৭

পায়ে পায়ে পথ ১৪১

উচ্ছিন্ন পরবাস ২৯৩

গঙ্গা খোঁজে ভগীরথ ৪৫৩

মহীতোষ বিশ্বাস : জল মাটি ও মেহনতি মানুষের কথাকার

মহীতোষ বিশ্বাসের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৪ নভেম্বর পূর্ব বাংলার যশোহর জেলার বাকড়ী গ্রামে। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে কৃষিনির্ভর এই গ্রামে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে আগের যুগে অধিকাংশ নারী ও পুরুষ নিরক্ষর থাকলেও পরবর্তী কালে স্কুলশিক্ষায় উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। মহীতোষ বিশ্বাসের দাদারা স্কুলে গিয়েছিলেন আর মেজদা গ্রামের বাইরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। দাদাদের দেখাদেখি মহীতোষ বিশ্বাসও বিদ্যালয়ের পথে পা বাড়ান। পরে কবিতা লিখতে শুরু করেন। সমস্যা ছিল একটাই। দরিদ্র পরিবার পড়াশোনার কাজে কাগজ জোগাতে পারে কিন্তু কবিতার জন্যে কাগজ কেনার কথা ভাবতেই পারে না। দূর সম্পর্কের এক মামা সে দায়িত্ব নেন আর তাতেই কল্পরাজ্যে যাতায়াত চলতে থাকে।

কিন্তু জীবন বড়ো কঠোর আর তার হিসেবপত্র বড়ো গোলমেলে। ১৯৪৮ সালে যশোহর অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন শুরু হলো। জমির মালিক আর ভাগচাষিদের মধ্যে বিবাদে এক সময় নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা জমির মালিকদের পক্ষ নিল। স্কুলের অনেক শিক্ষক কৃষকদের সমর্থক ছিলেন আর তাই তাঁদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলো। মহীতোষ বিশ্বাসের মেজদাও সে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন আর পুলিশের নির্যাতন এড়াতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমগ্রামে চলে আসেন। ওদিকে স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ হয় সেখানে মিলিটারি থাকার কারণে। তখন মনের খোরাক মেটাতে স্কুলপড়ুয়া মহীতোষ পাড়াতুতো জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যেতেন। জ্যাঠামশায় ছিলেন স্বল্প-শিক্ষিত কিন্তু সাহিত্য-প্রেমিক। তিনি বই দিতে রাজি হন তবে তাঁর বাড়িতে বসে পড়তে হবে। নবীন কিশোর রাজি হলেন কারণ পথেঘাটে ঘুরেও সময় কাটে না। সকালের দিকে সেখানে ঘণ্টা তিনেক বসে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের ''বঙ্কিম রচনাবলী'', ''শরৎ রচনাবলী'', ''শনিবারের চিঠি'' ইত্যাদি পড়া শুরু করলেন। বিনিময়ে জ্যাঠামশায়ের দুটি দুধের গোরু বিকেলবেলায় মাঠে চরিয়ে আনতে হত। গোরু নিজের মতো চরত আর কিশোরটি সকালে পড়া বই নিয়ে ভাবতেন। কাজের ফাঁকে কবিতা লেখাও চলত। এভাবে দুটো বছর স্কুলে না গিয়েই কেটে যায়। শেষে একদিন ঝোলায় কয়েকটা বই নিয়ে, রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে, দাদার কাছে চলে আসেন। দাদা তখন উদ্বাস্তু অঞ্চলের একটি স্কুলের অল্প মাইনের শিক্ষক। ভাইয়ের না-পড়া সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি দুটিকে তাদের মতো পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে দিয়ে, ভাইকে মধ্যমগ্রাম বালক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলেন। এক অবস্থাপন্ন প্রতিবেশী বন্ধুর বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা চলতে থাকল। শেষে ১৯৫৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলেন আর ভালো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণও হলেন।

সাহিত্যের প্রতি বাড়তি এক ভালোবাসা মনে থেকে গিয়েছিল। স্কুলে ঢোকার রাস্তায় গায়ে, দুটো বাঁশের মাছে, চাঁচে আটকানো থাকত ''স্বাধীনতা'' পত্রিকা। স্কুলে টিফিন খাওয়ার বিরতিতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মহীতোষ বিশ্বাসও পত্রিকাটি পড়তেন। আসলে সেদিনের মধ্যমগ্রামের ক্ষুদ্র সীমার বাইরের খবর মিলত সে পত্রিকায়। বিনা খরচে পড়াও যেত। রবিবারে থাকত ''কিশোর বাহিনী''র পাতা। সোমবারে স্কুলে গিয়ে সে পাতার গল্প ও কবিতা পড়তেন। পড়তে পড়তে লেখার ইচ্ছে জাগল। লিখে পাঠিয়েও দিলেন। ছাপা হলো। সেই প্রথম হাতে লেখা কবিতা ছাপার অক্ষরে দেখার সুযোগ মিলল। সে আনন্দের

সীমা নেই। পরে পরে আরও কিছু কবিতা ছাপা হলো। ''স্বাধীনতা''র পাশাপাশি ''যুগান্তর'' পত্রিকার ''ছোটোদের পাততাড়ি''-তেও দুটি কবিতা জায়গা পেল। তবে গল্প লেখা শুরু করতে আরও কিছুটা সময় লাগল। স্কুল পেরিয়ে এক সময়ে কলকাতার কলেজে ভর্তি হলেন। যাতায়াত ট্রেনে আর সেখানে অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকার খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ট্রেনের এক বাদাম ফেরিওয়ালাকে মাছে মাছেই দেখতেন আর সেটাই তাঁর প্রথম গল্পের বিষয় হয়ে উঠল। সে গল্প ছাপা হয় ''স্বাধীনতা'' পত্রিকায়। পরে কিছু শারদ স্মরণিকা আর স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতেও কবিতা ও গল্প ছাপা হয়। তারপর এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবিকার সন্ধান। পড়া যাঁর প্রধান নেশা, পাঠদান হয়ে উঠল তাঁর অবিকল্প ভালোবাসার পেশা। প্রথম অধ্যাপনা করলেন মেদিনীপুরের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে আর পরে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে।

এই বিদ্যামন্দিরেই ১৯৭৩ সালে আমি তাঁকে আমার শিক্ষক হিসেবে পাই। কলা বিভাগের নানা বিষয়ে নিয়ে যে সব ছাত্র অনার্স পড়ত, তাদের পাস-কোর্সে বাংলা পড়তে হত। তাতেই তাঁর কাছে আমার বাংলা পড়া। তাঁর সে কী অসাধারণ যে পাঠদান রীতি তা ঠিক কথায় বলে প্রকাশ করা যাবে না। পড়াতেন কথাসাহিত্য আর প্রথম বেশ কয়েকদিন কয়েকটি বিখ্যাত গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। গল্পের গুণ, তাঁর পাঠের অসাধারণ দক্ষতা, মাঝে মাঝে বিশেষ কিছু অংশের বিশ্লেষণ ইত্যাদি মিলে এক অসাধারণ প্রাপ্তি। আসলে তিনি আমাদের ধ্রুপদি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছিলেন। শাশ্বত সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদন করতে না পারলে সাহিত্যের সত্যিকারের পাঠক হওয়া যায় না। আর একটি দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ''দেবী চৌধুরাণী'' উপন্যাসটি পড়াতে শুরু করলেন। আমরা জানি যে, এই উপন্যাসটি বই হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। উপন্যাসের প্রথম বাক্যটি ছিল, ''ও পি—ও পিপি— ও প্রফুল্ল — ও পোড়ারমুখী।'' মুদ্রিত বাক্যটি পড়ে এর পুরো তাৎপর্য বোঝা যাবে না। আমরাও প্রথমে বুঝতে পারিনি। মেয়ের প্রতি মায়ের এই ডাক চার ভাবে আসে। মনে আছে সেদিন স্যার পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে শুধু এই বাক্যটি নিয়েই বলেছিলেন। বুঝিয়ে বলেছিলেন আদুরে পি থেকে পিপি ও প্রফুল্ল হয়ে পোড়ামুখীতে যাওয়ার মধ্যে কাহিনির কতখানি পূর্বাভাস থেকে গেছে। পরে বুঝেছিলাম শুধু পাণ্ডিত্য নয়, স্যারের বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে নিজের সৃজনশীলতা কাজ করত। মননের সঙ্গে সৃজনের মেলবন্ধন ঘটেছিল বলেই অতি সহজে, প্রায় গল্প বলার ভঙ্গিতে, তিনি সাহিত্যের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন।

কথাসাহিত্যে তাঁর বন্দরের কাল শেষ হয়ে গিয়েছিল গত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি। তার আগে নিতাই ও কুসুম নামের দুটি দরিদ্র যুবক-যুবতীর সংসার গড়ার স্বপ্নের কথা লেখেন ''সিঁদ'' গল্পে। আর একটি গল্প ''জৈব''তে একটি মৃত খাসির মাংস খাওয়ার জন্যে একজন ক্ষুধার্ত মানুষ আর একটি শীর্ণ কুকুরের টানা-পোড়েন দেখান। গল্পে পরে অবশ্য মানুষটি ওই ক্ষুধার্ত নেড়ি কুকুরের সঙ্গে তার নিজের ভাগ্যকে একাকার করে দেখতে পায়। তখন নিজেই ওই কুকুরের মুখে আগুনে ঝলসানো মাংস তুলে দেয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস ''জল মাটি মন'' ১৯৬৫ সালে ''জয়শ্রী'' পত্রিকায় ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৭ পর্যন্ত চলেছিল। বই হিসেবে প্রকাশ তার প্রায় সাত বছর পরে। ১৯৭৪ সালে পরিবর্তিত ''মাটি এক মায়া জানে'' নামে উপন্যাসটি প্রকাশ পায়।

যশোহর জেলার গ্রামজীবনের এক জলছবি ধরা ছিল সে উপন্যাসে। মহীতোষ বিশ্বাস কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে মাটি, ফসল, খরা, বান আর ক্ষেতের কৃষক ও কৃষি মজুরদের নিবিড় ভাবে চিনতেন। ঔপন্যাসিকের শুধু চিনলেই হয় না, উপন্যাসের পাঠকদের তা চেনাতেও হয়। তার জন্যে দরকার প্রাণময় ভাষা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গদ্য। সে গদ্য ''মাটি এক মায়া জানে''র লেখকের কলমে ছিল। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখেন—

চিত্রার পাশ ঘেঁষে আসতে আসতে ভৈরব নদ বাঁক নিয়েছে। আধখানা চাঁদের মতন। নামেই ভৈরব নদ। এমনিতে ছোটো খাটো। ভালোমানুষ। বর্ষাকালে খানিকটা ফুলেফেঁপে ওঠে। জটা ছড়ায়। তারপরে আবার শান্ত। আপন মনে বয়ে চলে। ভৈরবের বাঁক ছাড়িয়ে মাইল চার পাঁচ পথ। পথ মানে মেঠো পথ। সোজা ভিতর দিকে। আর তার পরেই শুরু হল কাঠুখালির বিল।

প্রায় ছবির মতো চিত্রা ও ভৈরব নামের দুটি নদী আর কাঠুখালির বিল নামে কিছুটা নীচু ও বিস্তৃত এক কৃষিক্ষেত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত থাকা মানুষজনের দেখাও মেলে। তাদের একজন হলো বলরাম, যে এ কাহিনির প্রধান চরিত্র। বলরাম মাকে হারিয়েছে আর বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করার পর তাকে বিশেষ দেখতে পারে না। তবে তার মনের দুঃখে অনেকটাই উপশম দেয় বাকসী গ্রামেরই মেয়ে পদ্মকলি। কিন্তু বিয়ের ইচ্ছে ভেঙে যায় কারণ পদ্মকলির বাবা জমির লোভে পাশের গ্রামের মামলাবাজ ও জোতদার বৃদ্ধ নীলমণির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে। পদ্ম আর বলরাম সিদ্ধান্ত নেয় রাতে দুজনে দূরদেশে পালিয়ে যাবে কিন্তু বলরাম শেষ মুহূর্তে গ্রাম ও ক্ষেতখামারের মায়া কাটাতে পারে না। পদ্ম বিয়ে হয়ে চলে যায় আর কয়েক বছর পরে বিধবা হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। ওদিকে পাড়ারই মেয়ে সুবাসীর সঙ্গে বলরামের বিয়ে হয়। একটি ছেলেও হয় তাদের। পদ্ম ও বলরামের জীবন ভিন্ন খাতে বয়ে গেলেও পদ্মের প্রতি বলরামের টান যায় না। গোপন শারীরিক সম্পর্কেও তারা জড়িয়ে পড়ে। গর্ভবতী পদ্ম সামাজিক নিন্দে থেকে বাঁচতে এক সময় আত্মহত্যা করে। ওদিকে বন্যায় পাকা ধান নষ্ট হয় আর তার কিছুকাল পরে খাওয়ার চালের অভাবে গ্রামের মানুষজন দূর গাঁয়ে সরকারি রাস্তা তৈরির কাজে মাটি কাটতে যায়। বন্যার পরে গ্রামে কলেরা ঢোকে আর বেশ কয়েকজন মানুষের সঙ্গে বলরামের বাচ্চাছেলে নারাণের প্রাণ নিয়ে চলে যায়। এভাবেই কাঠুখালির জীবন উঁচু -নীচু পথ পেরিয়ে এগোতে থাকে। এক সময় কাঠুখালির বিলের মাঠ শস্যের শ্যামলতা, কোমলতা ও প্রাচুর্য্যে ভরে ওঠে। সেই প্রাণময় প্রকৃতির মধ্যে বলরাম দেখে পদ্ম ও নারাণের বিদেহী আত্মাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঠুখালি কাউকে ছাড়ে না, কাঠুখালি ছেড়ে কেউ চিরকালের জন্যে যেতে পারে না। এটাই সে মাটির মন, এটাই তার মায়া।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল চারের দশকে কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা উপন্যাস ''পায়ে পায়ে পথ''। উপন্যাসের প্রেক্ষিত ছিল যশোহর জেলার একটি বিস্তৃত অঞ্চল। উপন্যাসের শুরুতে বিলভাসান গ্রামের মাঠে হেলিকপ্টার নামার কথা আছে। বোঝা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছোঁয়া লেগেছে এই সব গ্রামাঞ্চলেও। উপন্যাসে গোরা সেনা আসা, খাবারের দাম বাড়া, কেরোসিনের অভাব ইত্যাদি বিষয়ও উঠে আসে। তবে তারও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জমিদার, নায়েব আর পেয়াদাদের শাসন ও শোষণে ভাগচাষিদের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। শুধু খাজনা নয়, তার সঙ্গে আছে পার্বণি, তঔরি, নজরানা, ঈশ্বরবৃত্তি ইত্যাদি নামে বাড়তি টাকা আদায়। বেগার খাটা তো রয়েছেই। বিনা পারিশ্রমিকে কৃষকের শ্রমকে ভোগ করা। শুধু জমিদার আর কৃষকের দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, এর মাঝে ঢুকে পড়ে তালুকদার, পত্তনিদার, গাঁতিদার, জোতদার ইত্যাদি নানা মধ্যস্বত্বভোগী মানুষজন আর তার ফলে আর জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ে কৃষিজীবীদের অবস্থা। খরা হলে বা বান এলে আরও এলোমেলো হয়ে যায় সে জীবন আর তখন যেটুকু ব্যক্তিগত জমি ছিল তাও গোমস্তা ও নায়েবদের পেটে ঢুকে যায়। এমন এক প্রেক্ষিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বৈকুণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের ছোটো ছেলে সত্যপ্রসাদ ভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। শহরে পড়তে গিয়ে সে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাদেশিক কৃষক সভায় যোগ দেয় আর জমিদার-বাড়ি ছেড়ে সে বিলভাসানের কৃষক কৈলাস মণ্ডলের বাড়িতে থাকতে শুরু করে। তারপর মাসের পর মাস

ধরে এই সব মানুষজনের সঙ্গ করে ও ধীরে ধীরে তাদের সংগঠিত করে। পাশাপাশি গ্রামের মানুষেরাও তাতে যোগ দেয়। নারীদের একটি নিজস্ব বাহিনীও তৈরি হয়। জমিদার ও জোতদারদের ব্যক্তিগত বাহিনী সে আন্দোলন ভাঙতে এগিয়ে আসে। নিখিল নামের আর এক কৃষক আন্দোলনের নেতা সত্যপ্রসাদের মতের বিরোধীতা করে ''দালাল হালাল''-এর পথ নেয়। তার ফলে একজন কৃষকবিরোধী লোক খুন হয়। তাতে জমিদারদের সঙ্গি থানা ও পুলিশ আড়াল থেকে সামনে চলে আসে এবং অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। সত্যপ্রসাদকে জেলে পাঠানো হয় আর যশোহরের গ্রামগুলোতে পুলিশের অকথ্য অত্যাচার নেমে আসে। মেয়েরাও সে অত্যাচার থেকে রক্ষা পায় না।

আন্দোলন এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে কিন্তু বাংলা জুড়ে সে আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭এর জানুয়ারিতে ''বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল'' এবং ওই বছরের এপ্রিলে ''বঙ্গীয় জমিদারি ক্রয় ও প্রজাসত্ত্ব বিল'' তৈরি হয়। সে দুটি বিলে নানা ফাঁক থাকলেও জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটা বড়ো পদক্ষেপ ছিল। তাই বিলভাসানের বর্গাদার আন্দোলন তার মতো একটা পথ তৈরি করতে পেরেছিল। ধানকাটার পর মানুষের পায়ে পায়ে জমির মাঝ দিয়ে মেঠো পথ তৈরি হয়। নতুন করে ধান রোয়ার সময় সে পথ হারিয়েও যায়। লেখকের বিশ্বাস তেভাগা আন্দোলন, ধানকাটার পর মেঠো পথের মতো, নতুন করে আকার পাবে। বিপ্লবের যে মৃত্যু হয় না, তেভাগার দু-দশক পরে ছয় ও সাতের দশকের ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন সে বিশ্বাসকে মান্যতা দেয়।

১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয় ''উচ্ছিন্ন পরবাস'' উপন্যাসটি। এর শেকড় দেশভাগে। প্রধান দুটি চরিত্র হলো বিন্তি (বিনতা) ও শঙ্করা (শঙ্কর)। বিন্তির বাবা উমাপতি ঘোষাল পৈতৃক ভিটে, জমিজমা ও শিষ্যবাড়ির প্রণামী মিলে এক স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছিল আর তার টানে দেশভাগের পরে নানা অসুবিধে সত্ত্বেও বেশ কয়েক বছর থেকে গিয়েছিল। তারপর যেদিন পরিবারটির আর প্রাণে বাঁচার আশা রইল না, তখন একবস্ত্রে শরণার্থী হয়ে এদেশে এসে হাজির হয়েছিল। তখন উমাপতির সংসার বলতে স্ত্রী আর ছেলে। রেল স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে কামড়া-কামড়ি করে কিছুটা জমি পায় আর জঙ্গলের মধ্যে হোঁগলা ও বাঁশ দিয়ে একটা বাড়ি বানায়। সে বাড়িতেই জন্ম হয় বিনতার। উদ্বাস্তুদের জন্যে তৈরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উমাপতি সামান্য মাইনেতে শিক্ষকতার কাজও পায়। মনে হয়েছিল ছেলেটা বড়ো হলে সুরাহা হবে কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। স্ত্রীও শোক ও দুঃখে এক সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। উমাপতির চাকরির কাল শেষ হয়। তখন পেটের খিদে মেটাতে বিন্তিকে পড়াশোনা ছেড়ে চালের চোরা চালানে যোগ দিতে হয়। গ্রামাঞ্চল থেকে চাল কিনে, ট্রেনে করে শিয়ালদহতে নেমে, দোকান ও বাজারে বিক্রি করা। ছয়ের দশকের শেষ থেকে সাতের দশকের মাছামাছি পর্যন্ত তীব্র চাল সঙ্কটের সময় এই চাল পাচার নিত্যদিন ঘটত। রেল পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কাজটি করা সহজ ছিল না। ধরা পড়লে নানা শাস্তি দেওয়া হত। বিন্তির মতো অনুভা, মালতী, রতন ও নানা বয়সের অনেকেই পেটের দায়ে সে কাজে ছিল। ছিল শঙ্করও, যার বাবা পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে খুন হয়েছিল আর ধর্ষিত হয়েছিল মা। সেই মা প্রায় পাগল হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে আসে আর এক সময় সন্তান প্রসব করে কোথায় হারিয়ে যায়। শঙ্করা রেল লাইন থেকে এক সময়ে মুদিখানার মালিক নিবারণের ঘরে জায়গা পায়। গঞ্জনা শুনেছে কিন্তু আশ্রয় পেয়েছে। শঙ্করা পরে চাল পাচারে যুক্ত হয় আর রেল লাইনের ধারে মাথা গোঁজার মতো একটা জায়গা খুঁজে নেয়।

উপন্যাসে ১৯৫০ সালে ভেসে আসা উদ্বাস্তু মানুষের একটি কলোনি গড়ে তোলার যেমন নিঁখুত বর্ণনা আছে, তেমনই সে কলোনির মানুষের ষাট ও সত্তরের জীবন ও জীবিকার অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। মুদিখানার মালিক নিবারণের ছেলে পলাশ বাবার অর্থবল আর নিজের রাজনৈতিক যোগসূত্রে বেশ

বলীয়ান। সে বিন্তির দিকে হাত বাড়ায় আর প্রত্যাখ্যাত হয়ে বড়ো কোনো ক্ষতি করার মতলব আঁটে। বিন্তির সঙ্গে শঙ্করার ভালো সম্পর্কের কারণে সে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে আর একদিন জনা চারেক সঙ্গি জুটিয়ে রাতের বেলা বিন্তিকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর ধর্ষণ করে। ইচ্ছে ছিল ভোগের ইচ্ছে মিটলে মেরে ফেলার কিন্তু শঙ্করা এসে উদ্ধার করে। শঙ্করার সঙ্গে মারামারির সময় পলাশ নেড়া ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। তারপর থানা ও আদালত পর্ব। তবে একটি জরুরি তথ্য হলো ধর্ষণের ফলে বিন্তি গর্ভবতী। এই জায়গাটা যে-কোনো কথাকারের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য একটা রূপ দেওয়া কঠিন। মহীতোষ বিশ্বাস সেটা পেরেছেন। বড়ো সুন্দর লিখেছেন যে, শঙ্করার মনে হয় তার ধর্ষিতা মা আর ধর্ষিতা বিন্নি যেন তার জন্মমাটির মতোই দলিতা ও ধর্ষিতা। এরা তিনজন ''সমভূমিতে লগ্ন হয়ে যেন একীভূত হয়ে যায়।'' দেশভাগ এবং দেশভাগ উত্তর প্রান্তিক মানুষের এক অসামান্য উপন্যাস হলো ''উচ্ছিন্ন পরবাস''।

২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল চতুর্থ উপন্যাস ''গঙ্গা খোঁজে ভগীরথ''। এ উপন্যাসের কাহিনি-কাল বিশ শতকের দুয়ের দশকের শেষ দিক থেকে সাতের দশকের শুরুর দিক। পূর্ববঙ্গের এক নমশূদ্র পরিবারে একটি শিশুর জন্ম দিয়ে এ কাহিনির সূচনা। প্রবল বর্ষার দিনে জন্ম বলে ধাইমা নাম দিয়েছিল ভগীরথ। বাবার অকালমৃত্যু তাকে অসহায় করে তোলে। স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করলেও একসময়ে লোকের বাড়িতে কাজে ঢোকে। উচ্চবর্ণের বাড়িতে ভাতের সঙ্গে অপমানও মেলে। সে অপমান অসহ্য হয়ে উঠলে প্রতিবাদ করে কিন্তু বিকল্প কাজের সন্ধানে অন্যত্র ছুটতে হয়। এক সময়ে এক ব্যাপারির নৌকোয় কাজ পায়। শারীরিক বল আর কাজে মন থাকার কারণে প্রিয় হয় মালিকের। তবে রাতে নৌকায় লুটেরার দল উঠলে তাদের নেতাকে সে অস্ত্রের ঘায়ে কাবু করে ফেলে। তারা চিনতে পারে ভগীরথকে আর বদলা নেওয়ার ধমকি দিয়ে যায়। ততদিনে দেশ ভাগ হয়েছে। গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে বনগাঁতে চলে আসে ভগীরথ। তারপর রামচন্দর নামে একজন মানুষের কাজে সাহায্য করায় তার বাড়িতে আশ্রয় পায়। কঠোর শ্রমে বনজঙ্গল কেটে এক বিঘে চাষের জমি তৈরি করে। ওদিকে মায়ের মৃত্যু সংবাদ পায়। পরে রামচন্দরের মেয়ের সঙ্গে ভগীরথের বিয়ে হয়। শ্বশুর তাকে বাড়ির কাছে বাড়ি করে থাকতে বলে কিন্তু উদ্যমী মানুষ হিসেবে সে বউ মালাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর প্রবল শ্রম, চেনা মানুষের সাহায্য, বিষয়বুদ্ধি এবং কিছুটা ভাগ্যের কারণে জমিজমা থেকে বিশাল এক সম্পদের মালিক হয়ে ওঠে। তখন তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ তেমন আর কাজ করে না। ওদিকে নকশাল আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে আর খুন হতে হয় ভগীরথকে। সে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তার এক ছেলেও। বাবাকে মেরে সে নিজেকেও মারে। উপন্যাসের শেষ দিকে কথাকারের এক অসাধারণ উপলব্ধির কথা আছে—

> ব্রাত্যতা, অশিক্ষা, দারিদ্রের অভিশাপ থেকে তুমি মুক্তি দিতে
> চেয়েছিলে তোমার বংশ-ধারাকে। খুঁজতে চেয়েছিলে গঙ্গাকে।
> কিন্তু তোমার সাধনা ব্যর্থ। নীতিভ্রষ্ট মানুষ কখনও খুঁজে পায় না
> গঙ্গাকে।

মহীতোষ বিশ্বাসের পরের উপন্যাস ''বিন খংগড়ৈ সংগ্রাম'' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এটি ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জীবনভিত্তিক একটি উপন্যাস। প্রাচীন কাল থেকে সমাজের একটি বিশাল সংখ্যক মানুষকে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের ভিতরের পুকুর ও কুয়োর জল স্পর্শ করার অধিকার ছিল না। অনুমতি ছিল না দেবতার মন্দিরে ওঠার। রাতের আশ্রয় মিলত না ধর্মশালা বা অতিথি নিবাসে। এমনকী ভাড়া দিতে চাইলেও গোরু বা ঘোড়ার গাড়ি মিলত না। স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে বেঞ্চে বসার অনুমতি ছিল না। মেঝেতে বসতে হত। ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকেও